জাপানে বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের জাদুঘর প্রসঙ্গে

প্রবীর বিকাশ সরকার

জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে অনেকেরই ধারণা সুস্পষ্ট নয়। অধিকাংশ বাঙালি মনে করেন স্বাধীনতার পর জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে জাপানের ইমেজ হচ্ছে ফুজিয়ামার দেশ, টোয়োটা গাড়ির দেশ, সোনি রেডিও-টিভির দেশ, নোবেল বিজয়ী কাওয়াবাতা ইয়াসুনারির দেশ আর বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি পারিমাণে ODA প্রদানকারী দেশ। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছে জাপান এটা সত্যি কিন্তু আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার বাইরে যে আরও একাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান সে সম্পর্কে বাঙালির ধারণা নেই বললেই চলে। অবশ্য দুদেশের মধ্যে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক সম্পর্কও বিদ্যমান যার সূচনা হয়েছিল মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের প্রথম দিকে। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, বৃটিশ-ভারতের যুগে পূর্ববাংলা থেকেই এদেশে প্রথম বাঙালি পর্দাপণ করেছিলেন তাঁর নাম মন্মথনাথ ঘোষ যশোহর থেকে এসেছিলেন ১৯০৬ সালে। অবশ্য কিশোর বিপ্লবী হেরাম্বলাল গুপ্ত (১৮৮৯-১৯৬৫) মন্মথনাথ ঘোষের আগে এদেশে পদার্পণ করেছিলেন ১৯০২ সালে বলে তাঁর এক স্মৃতিচারণকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি অধ্যাপক কুসাবিরাকি সানজো (১৯২৮-) লিখিত *'রেকিশি নি অকিজারি নি সারেতা ইনদো দোকুরিৎসু নো হিৎসুওয়া'* বা 'ইতিহাসের আড়ালে ঢাকা ভারতীয় স্বাধীনতার গুপ্তকথা' গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে। কিন্তু এই তথ্য কতখানি সত্যি বলা মুশকিল। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামেও একজন এরপরে এসেছিলেন জাপানে পূর্ববাংলা থেকে। মন্মথনাথ ঘোষ দুবার জাপান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এবং সুরেশচন্দ্র গ্রন্থও লিখে রেখে গেছেন বলে লেখক.গবেষক সুব্রতকুমার দাসের লেখা থেকে খবর পাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা অঞ্চল থেকে কে কবে কখন এদেশে প্রথম এসেছিলেন সঠিক করে বলা কঠিন কেননা সে ধরনের তথ্যউপাত্তের অনুসন্ধান এখনো চলছে।

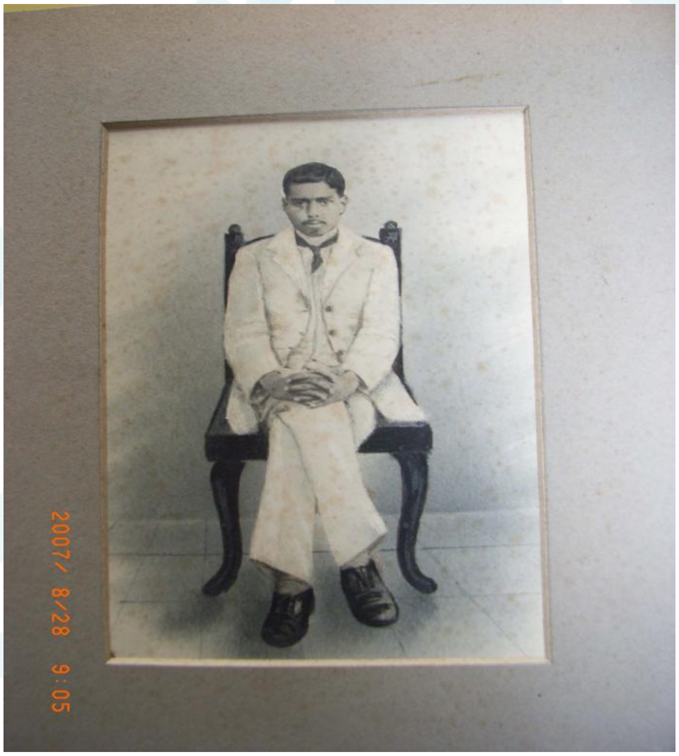

যাই হোক, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অনেক বাঙালি ও জাপানি দুঅঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করেছেন ধর্ম, ভাষাশিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে। বাংলা অঞ্চলে জাপান থেকে গিয়েছিলেন নমস্য পন্ডিত শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিন, বৌদ্ধভিক্ষু শিতোকু হোরি; চারজন চিত্রশিল্পী য়োকোয়ামা তাইকান, শুনসো হিশিদা, কাম্পো আরাই, কাৎসুদা শোওকিন; বৌদ্ধপন্ডিত কিমুরা নিক্কি; দুজন জুদো প্রশিক্ষক শিনজো তাকাগাকি, জিননোৎসুকে সানো; ইকেবানা প্রশিক্ষিকা মাকি হোশি; সঙ্গীতজ্ঞ গেনজিরো মাসু; ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের পন্ডিত অধ্যাপক ৎসুশো বিয়োদো; দারুশিল্পী কুসুমোতো প্রমুখ খ্যাতিমান জাপানিরা। বাংলা থেকে এসেছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বিপ্লবী হেরাম্বলাল গুপ্ত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পন্ডিত ক্ষীতিমোহান সেন, চিত্রশিল্পী মুকুল দে, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড.কালীদাস নাগ, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ.শিক্ষাবিদ অপূর্বকুমার চন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সংস্কৃতি-গবেষক বিনয়কুমার সরকার; বিপ্লবী অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী রমানাথ রায়, বিপ্লবী তারকনাথ দাস; জাপান প্রবাসী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কট্টর সমর্থক সত্যেন সেন প্রমুখ।

যুদ্ধের পরও এই ধারা পুনরায় উন্মুক্ত হয়ে অদ্যাবধি অব্যাহত। ষাটের দশকে এদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তাঁকে কেন্দ্র করে খন্ডকালীন সময়ের জন্য একটি প্রাচ্যাদর্শী শিক্ষা আন্দোলনই গড়ে উঠেছিল। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট জাপানি ব্যক্তিরা। এই সময় দুই বাংলা থেকেই বেশ কিছু স্বনামধন্য বাঙালি এসেছিলেন। নতুন প্রজন্মের বিশিষ্ট কজন শিক্ষাবিদ কলকাতা, শান্তিনিকেতন এবং ঢাকায় গিয়েছেন। তাঁরাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে জাপানি জনমত গঠন ও শরণার্থীদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে জাপান সফরে এসেছিলেন সরকারি আমন্ত্রণে। তাঁর দোভাষী এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন স্বনামধন্য রবীন্দ্রগবেষক. প্রাক্তন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক ড.কাজুও আজুমা।

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে পর্বতসমান শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করে যিনি জাপানে অধিষ্ঠিত আছেন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, শিক্ষাবিদ ড.রাধাবিনোদ পাল (১৮৮৬-১৯৬৭)। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার (ভূতপূর্ব নদিয়া) প্রত্যন্ত অঞ্চল তারাগুনিয়া ইউনিয়ন, দৌলতপুর উপজেলার সালিমপুর গ্রামের এক নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম পাল ছেলেবেলা থেকেই প্রচন্ড পরিশ্রম ও মেধার অধিকারী ছিলেন। প্রচন্ড লড়াই করে মানুষ হয়েছেন ভারতে, জীবন শুরু করেছিলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে ১৯১১ সালে। তারপর ভারত সরকারের উচ্চপদে চাকরি করেছেন, আইন পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের খন্ডকালীন বিচারপতি হয়েছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন কিছুকাল। তারপরই ডাক পড়েছিল ১৯৪৬ সালে আয়োজিত টোকিও মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্য। এসেছিলেন এবং আড়াই বছর এখানে থেকে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তার মূল্যায়নস্বরূপ বিশ্বব্যাপী খ্যাতির শীর্ষে আজও অধিষ্ঠিত তিনি। এই বিচারে বিচারপতি পাল ২৮ জন তথাকথিত জাপানি যুদ্ধাপরাধীকে সকল অভিযোগ থেকে খারিজ করে দেন। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধকালীন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো হিদেকি অন্যতম প্রধান। শুধু তাই নয়, এই বিচারকে তিনি 'বিচারের নামে প্রহসন', 'বিজিতের উপর বিজয়ীর বিচার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ১২শ পৃষ্ঠার রায়ের কিছু কিছু যুক্তি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে পন্ডিতদের মধ্যে কিন্তু এই বিরল রায়টি আজ একটি মাইলফলক বা নির্দেশিকা যুদ্ধাপরাধীদের জন্য ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে , যা না থাকার কারণে তিনি টোকিও মিলিটারি ট্রাইব্যুনালকে অবৈধ বলে মনে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর এই বিচক্ষণ রায় এবং পরবর্তীকালে হিরোশিমাকেন্দ্রিক বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে বাঙালিরা গর্ববোধ করতেই পারেন কিন্তু জানেন না যেমন তাঁর ইতিহাস তেমনি অজ্ঞাতপ্রায় তাঁর অমূল্য কীর্তি-কাহিনী দুই বাংলাতেই। গত ৬০ বছর ধরেই রাজনৈতিক ও ব্যক্তিঈর্ষার চরম অবহেলার শিকার ড.রাধাবিনোদ পাল।

শতবর্ষ প্রাচীন সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্ক দুজাতির মধ্যে বিরাজমান থাকলেও এদেশে আর কোনো বাঙালি এ্যাত বড় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন বলে জানা নেই। তাঁর স্মৃতিময় জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় টোকিও থেকে ঘন্টা

দুয়েক দূরে অবস্থিত কানাগাওয়া-জেলার নয়নাভিনাম পর্যটন শহর ‘হাকোনে মাচি’র এক নির্জন সবুজ পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত ‘পাল-শিমোনাকা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন’ ভবনে। চমৎকার নকশাকৃত দ্বিতল একটি ভবনে প্রদর্শিত হচ্ছে ড.পাল এবং তাঁর আমৃত্যু বন্ধু শিমোনাকা ইয়াসুবুরোর স্মৃতিবিজড়িত অনেক মূল্যবান আলোকচিত্র, গ্রন্থ, চিঠি, পান্ডুলিপি, পত্রপত্রিকার কাটিং এবং তাঁদের একদা ব্যবহৃত পোশাক, জিনিসপত্র। বিশেষ করে বিচারপতি পালের পরিত্যক্ত প্রায় সবই কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণে বেশ অবহেলার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে আমার তিনবার পরিদর্শনের সময়। যেমন ট্রাইব্যুনালের সময় বিচারপতি ব্যবহৃত চেয়ারটির গদি ছিঁড়ে গিয়ে কদাকার রূপ ধারণ করেছে। তাঁর খবর, সাক্ষাৎকার, ছবি, মুদ্রিত অনেক পত্রপত্রিকার কাটিং নোনাজলের শিকার হয়ে মুছে যেতে বসেছে। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা নিহোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে প্রদত্ত একটি সম্মাননা পত্র রং উঠে ঝাপসা হয়ে গেছে। শোকেসের ভিতরে প্রদর্শিত, অ্যালবামে রক্ষিত অতিমূল্যবান আলোকচিত্রগুলো জল লেগে ভিজে চটচটে হয়ে গেছে; বেশকিছু একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে রং ওঠে গিয়ে। এসব দুস্প্রাপ্য ছবির পজিটিভ নেই বললেই চলে। ১৯৫২ সালে দ্বিতীয়বার জাপান ভ্রমণের সময় তিনি ইসুজু মোটর কোম্পানির কারখানা পরিদর্শনকালে বেশ কিছু ছবি তোলা হয়েছিল সেগুলো একটি অ্যালবামে রক্ষিত আছে কিন্তু অধিকাংশই বিনষ্ট।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছে শিমোনাকা কিনেন জাইদান তথা শিমোনাকা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ১৯৭৪ সালে বলে আমাকে জানিয়েছিলেন এক সাক্ষাৎকারে ১৯৯৯ সালে প্রবীণ সাংবাদিক.লেখক.গবেষক.অধ্যাপক মাসাআকি তানাকা (১৯১১-২০০৬) তাঁর বাসভবনে। বস্তুত তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার এই পাল-শিমোনাকা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সূত্র ধরেই। ১৯৯৯ সালে শিমোনাকা ইয়াসাবুরো প্রতিষ্ঠিত জাপানের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন আধুনিক প্রকাশনা সংস্থা ‘হেইবোনশা পাবলিশার’ কোম্পানির সহোদর প্রতিষ্ঠান ‘ফোটো প্রিন্টিং কোম্পানি’র লাইব্রেরিতে একটি ছোট্ট চটিবই ‘পাল হানজি নো কোতোবা’ অর্থাৎ ‘বিচারপতি পালের কথা’ আবিষ্কার করি। তাতেই প্রথম জানতে পারি যে জাপানে বিচারপতি ড.রাধাববিনোদ পালের একটি স্মৃতিজাদুঘর আছে। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জাদুঘর পরিদর্শন করার পর ছবি তুলে সেগুলো নিয়ে তানাকা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার, এই কারণে যে, তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এমনকি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর একান্ত শয়নকক্ষে শিয়রের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে করমর্দনরত বাঁধাই করা একটি আলোকচিত্র রক্ষিত আছে দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলাম! ছবিটি ঢাকায় তোলা ১৯৭২ সালে। তাঁর জীবনে আমিই ছিলাম শেষ সাক্ষাৎকারী বাঙালি, বলেছিলেন তিনি।

বিচারপতি পালের সঙ্গে তানাকার ছিল গভীর, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক--ড.পাল তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন ড.পাল এবং শিমোনাকার মধ্যে সম্পর্ক বন্ধনের সেতু। তিনি শিমোনাকার শিষ্য ছিলেন কৈশোরকাল থেকেই। আমার তোলা

ছবিতে জাদুঘরের বিপর্যস্ত চিত্র তাঁকে দারুণ ব্যথিত করেছিল কেননা তিনি ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েক বছর তিনি ওই ভবনে যেতে পারেননি। ছবিগুলো তিনি রেখে দিয়েছিলেন। হয়ত জাদুঘরের যত্ন নেবার জন্য বলেছিলেন শিমোনাকা ইয়াসাবুরোর ছেলেদেরকে যাঁরা শিমোনাকা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু কিছুই হয়নি। এরপর ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে আমি আরও দুবার পরিদর্শন করি জাদুঘরটি, আলোকচিত্র এবং দলিলপত্রাদির কপি করে নিয়ে আসি পরিকল্পাধীন একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালে সৌন্দর্যের লীলাভূমি কিয়োতোর এক সবুজ পাহাড়ে অবস্থিত শোওয়ানোমোরি উদ্যানে এবং ২০০৫ সালে টোকিয়োস্থ কুদানশিতা শহরে অবস্থিত শিন্তো ধর্মীয় যুদ্ধসংক্রান্ত 'ইয়াসুকুনি জিনজা' মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিচারপতি পালের দুটি চমৎকার স্মৃতিফলক স্থাপিত হয়েছে। পাথরে প্রতিচিত্রিত বিশাল ছবি দুটো মূলত শিমোনাকা ইয়াসাবুরোর সংগ্রহে ছিল দীর্ঘবছর। সম্প্রতি ড.পালের একনিষ্ঠ ভক্তরা এই স্মৃতিফলক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত কিয়োসেরা কর্পোরেশন এবং কেডিডিআই কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ড.ইনামোরি কাজুও (১৯৩২-)। কিয়োতোতে স্মৃতিফলক স্থাপন প্রকল্পে জাপানের ১৫০টি বড় ও মাঝারি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল। এটি উদ্বোধন উপলক্ষে ড.পালের পুত্র আইনজীবী প্রশান্তকুমার পাল সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

পাল-শিমোনাকা স্মৃতিজাদুঘরটি অনতিবিলম্বে সংস্কারের প্রয়োজন তা নাহলে সম্পূর্ণভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু কে করবে এই কাজটি। শিমোনাকার ছেলে শিমোনাকা নাওইয়া এখন অতিশয় বৃদ্ধ এবং হেইবোনশা পাবলিশারের ব্যবসাও তেমন লাভজনক নয়। এটি সংস্কার করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য।

লেখক: জাপান প্রবাসী লেখক.গবেষক
probirbikashsarker@gmail.com

আলোকচিত্র ক্যাপশন:
১] তরুণকালে রাধাবিনোদ পাল
২] যে চেয়ারটি ব্যবহার করেছিলেন বিচারপতি পাল
৩] রাধাবিনোদ পাল ও শিমোনাকা ইয়াসাবুরো
৪] ইয়াসুকুনি জিনজা প্রাঙ্গণে রাধাবিনোদ পালের স্মৃতিফলক